

আক্রান্ত তরুণদের সুপথে আনতে যা করণীয়

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ

আনু মুহাম্মদ

কিছুদিন ধরে চারদিকে একটা হাহাকার। সরকার, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবকদের মধ্য থেকে এই প্রশ্ন মাঝেমধ্যেই উঠছে, 'কী করে আমাদের তরুণেরা জঙ্গি হয়ে যাচ্ছে?' এর আগেও শুনেছি, 'তরুণদের মধ্যে অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে।' আমার তখন একটা পাল্টা প্রশ্ন আসে মাথায়, 'তরুণেরা যদি অন্য পথে যেতে চান, তখন আপনারা কি তা হতে দেন?'

আমাদের সমাজের শৈশব থেকেই অসন্তব একটা চাপ ও তাড়ার মধ্যে থাকতে হয়। স্কুলে সিলেবাস ভারী করা হয়েছে, বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে, নতুন নতুন বিষয় যোগ করা হয়েছে, পরীক্ষার চাপ বেড়েছে। শিক্ষার ভয়াবহ মাত্রায় বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের অভাব, প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নেই। যারা আছেন, তাঁদের অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেই। এই চাপের সমাধান হিসেবে হাজির হয়েছে কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউশনি আর গাইড বই। অভিভাবকের বেড়েছে বায়ের বোঝা। আর ঘন ঘন পরীক্ষার চাপ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ছোট্টাছুটি করতে হয় গাইড বই, স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর, নোট ইত্যাদির মধ্যেই। দম ফেলার সময় নেই। যদিবা কিছু সময় বের করা যায়, তা আনন্দ নিয়ে কাটানোর উপায় নেই। খেলার মাঠ সব উধাও। সেগুলোতে এখন বহুতল ভবন বা শপিং মল; কীভাবে সর্বজনের এসব স্থান ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গেল, এর খোঁজ কেউ জানে না। নদী, খাল, পুকুর তো আরও আগেই শেষ হয়ে দখল নয়তো ভয়াবহ দূষণের শিকার। সুতরাং সাঁতার বা পানির কাজেও যাওয়ার ওপায় নেই। কোথায় যাবে তারা? পাড়ায় পাড়ায় গ্রন্থাগার থাকা উচিত, নেই। শিক্ষার্থীদের গাইড বই মুখস্থ করা ছাড়া আর কোনো বই পড়ার সুযোগ কই?

সন্তানদের কাছে অভিভাবকদের দাবি, 'আশপাশে তাকাতে না, বাইরের বই পড়তে না, অন্যদের সঙ্গে মিশতে না, বাইরে যাবে না, নিজের দিকে দেখো, ফাঁসি হতে হবে, বড়লোক (অনেক অর্থের মালিক) হতে হবে।' প্রায় অভিভাবকই চান সন্তান আত্মকেন্দ্রিক হোক, বাজার বুয়াক, সমাজ সম্পর্কে নিষ্পৃহ হোক, 'অন্য'দের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শিখুক। শিক্ষকেরা চান শিক্ষার্থী গাইড বই, নোটবই পড়ুক, কোচিং সেন্টারে পড়ুক। সরকার চায়, এরা সবাই চিন্তাশূন্য, বিশ্লেষণশূন্য ও প্রশ্রয়না রোবট-সমর্থক হোক।

বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা ছাড়াও কিছু বায়বহুল প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা জানি। খুবই নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও তদারকির মধ্যে; বৈধ দেওয়া সীমার মধ্যে শিক্ষা, চিন্তা ও তৎপরতায় থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের। প্রাইভেট বা বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নেই, কোনো সংগঠনের প্রকাশ্য অস্তিত্ব বা তৎপরতা নেই। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ক্লাব বা সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কিছু ক্লাস-বহির্ভূত তৎপরতা করেন। এর বাইরে যাওয়ার সাধ্য শিক্ষার্থীদের নেই। এই নিয়ন্ত্রিত জগতে কীভাবে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত তারুণ্যের বিকাশ ঘটবে? কাঠামোবদ্ধ চিন্তা, স্পন্দনশীল উদ্ভাস বা বিজ্ঞাপনী সক্রিয়তাকে তারুণ্য বলা যায় না।

পাবলিক বা সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন আছে, সাংস্কৃতিক সংগঠন নাট্যদল ইত্যাদিও আছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য, নিপীড়ন, বৈষম্যবিরোধী চিন্তা ও সক্রিয়তায় এসব সংগঠনের ভূমিকা ও লড়াইয়ের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আছে। কিন্তু যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক, তাদের ছাত্রসংগঠন আর তরুণবাহকে প্রশাসন ও শিক্ষকনেতাদের জন্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই জমা হয়েছে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা। সরকারি ছাত্রসংগঠনের আধিপত্য এতটাই প্রবল যে অনেক সময় হল বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না।

একইভাবে সরকারি ছাত্রসংগঠনের দাপটে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য হলের ভেতরের পরিস্থিতি খুবই নাজুক। পরিস্থিতি এমন যে অনেক সময় বোঝাই যায় না যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা হল প্রশাসন আছে। অনেক সময় ছাত্রদের বাধ্য করা হয় সরকারি দলের অনুষ্ঠান বা মিছিলে যেতে, অনেক সময় কোনো না-কোনো কারণে মজি মোতাবেক হলের গেট বন্ধ করে রাখা হয়, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যেতে পারেন না, হলের ভেতর র‍্যাগিং বা নতুন ছাত্রদের শায়েস্তা করে প্রথমেই তাঁদের ক্ষমতার কেন্দ্র সম্পর্কে শিক্ষাদান করা, এটা প্রায় নিয়মিত ঘটনা। একই প্রক্রিয়ায়-অন্ন, মাদক, ছিনতাই, নির্যাতন, হয়রানি সবই বাড়তে থাকে। এসবের প্রতিবাদ করতে গেলে আরও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

এগুলো একদিনে হয় না, এই ছাত্ররা এমনি এমনি এ রকম সন্ত্রাসী বা নির্যাতকে পরিণত হন না। ক্ষমতাবান ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতার প্রভাববাণিজ্য অক্ষত রাখতে গিয়ে ছাত্রদের কলুষিত করে।



শৃঙ্খল আর চাপ থেকে তরুণেরা মুক্ত না হলে এই মুক্তির পথ তৈরি হবে না

অর্থ আর ক্ষমতার লোভে আক্রান্ত হয়ে, কিংবা ফাঁদে পড়ে এই তরুণেরা হয়ে দাঁড়ান অসংখ্য তরুণের জন্য বিভীষিকা। তাঁরা নিজেরাও যে এতে নিরাপদ থাকেন, তা নয়। নিজেদের মাঝে সংঘাত, অন্যের জমি দখল, টেডার দখল কিংবা অর্থের ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে গিয়ে খুনোখুনির অনেক ঘটনাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রশাসনও তাঁদের ব্যবহার করে। উপাচার্য পদ নিয়ে সংঘাত, শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমনে ছাত্রলীগের হামলা এমনি এমনি ঘটে না।

প্রকৃতপক্ষে শিশু থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিশু, কিশোর, তরুণেরা এখন একযোগে বিভিন্ন দিক থেকে অভিভাবক, শিক্ষা-বণিক সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের অবিরাম আক্রমণের শিকার। এ ছাড়া আছে জঙ্গিবাদসহ নানা প্ররোচনা ও ফাঁদ। এই যদি হয় স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পরিস্থিতি, তাহলে কীভাবে তরুণেরা নিজেদের ভেতরের অসীম ক্ষমতার সন্ধান পাবেন? তাঁর ভেতরে যে অদম্য শক্তি, কীভাবে তার প্রকাশ ঘটাবেন? কীভাবে তাঁর মধ্যে সামষ্টিক স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থের যুক্ততার বোধ আসবে? কীভাবে তিনি জানবেন বুঝবেন, সমষ্টি মানুষ আর প্রকৃতি তাঁর অস্তিত্বের অংশ? কীভাবে নিজের থেকে নিজে বড় হবেন? অন্যায়-অযৌতিক দম বন্ধ করা পরিবেশের বিরুদ্ধে কেউ কি প্রতিরোধ করতে পারেন, যারা নিজেরাই মুক্ত হওয়ায় শ্বাস নিতে পারেন না। তাঁদের স্বার্থপর চিন্তা ও বিশ্লেষণের ক্ষমতাহীন অবস্থা তাঁদের কোথায় নিয়ে যাবে? কেউ জঙ্গি হবেন, কেউ সন্ত্রাসী হবেন, কেউ 'সফল' হয়ে মানুষ ও প্রকৃতিবিনাশী তৎপরতার দিকপাল হবেন।

শিক্ষাকালে চাপ, শিক্ষা শেষে অনিশ্চয়তা, পথঘাট ভয়ের, চারদিক থেকে প্রত্যাশা পূরণের তাগিদ—সবকিছুর মধ্যে পিষ্ট সাধারণ তরুণেরা। প্রশ্রয় ফাঁস, ভর্তি-বাণিজ্য, কোটা, নিয়োগ-বাণিজ্যের এত সব পাহাড় কখন অতিক্রম করতে পারেন? একদিকে এত বাধা, অন্যদিকে বাজারের চাকচিক্য; একদিকে বন্ধনা, অন্যদিকে চোরাই টাকার উৎসব। অন্যান্য-অবিচারের প্রভুরাই সমাজ চালায়। তরুণদের সামনে তারাই একেকটি দেয়াল। সন্ত্রাসের টার্গেট কিংবা সন্ত্রাসী বানানোর জালের সামনেও প্রধানত তরুণেরাই। একদিকে ভোগের টান, অন্যদিকে অক্ষমতার বন্ধনা। ইহকালের অসন্তোষ দূর করতে টানে পরকালের অনন্ত সুখের ডাক। জঙ্গি উত্থান তাই আলগা কোনো উপদ্রব নয়। দেশের ভেতর নৃশংসতা ও রোবট বানানোর কারখানা থেকেই সে বের হচ্ছে। তার বৈশ্বিক উৎস, পৃষ্ঠপোষকও যথেষ্ট। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের হিংস্রতা, বিদ্বেষ, দখল, গণহত্যা আর কৌশলগত খেলা জোগান বাড়াচ্ছে ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের। জঙ্গির জমিন যেভাবে হচ্ছে, সেদিকে নজর দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সীমাবদ্ধতা ও অনিশ্চয়তা দুটোই আছে।

গত ১ জুলাইয়ের ভয়ংকর ঘটনার পর থেকে 'জঙ্গি দমনে' সরকারি বাহিনী করছে অনেক কিছুই। যেমন রাস্তাঘাটে তল্লাশি বাড়ানো; ঢাকা শহরের ভাসমান মানুষদের হয়রানি ও উচ্ছেদ; নিম্ন আয়ের মেস-বাসীদের পাইকারি হয়রানি ও উচ্ছেদ; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ;

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন সভা-সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ ও সীমিতকরণ; সন্দেহ বিস্তার, ধরপাকড়, ভয় ছড়ানো ইত্যাদি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জঙ্গি নামে মামলা দেওয়ার ভয় দেখিয়ে নিরীহ লোকজনদের আটক করা। হেফাজতে মারা যাচ্ছে কথিত জঙ্গি। ভয় ধরানো এসব তৎপরতা দিয়ে কতটা জঙ্গি দমন হবে, কতটা তার পুনরুৎপাদন হবে, তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

জঙ্গিবাদী তৎপরতা শুধু সহিংসতা নয়, এটা একটা মতাদর্শ; যার কেন্দ্রে আছে নিজ ছাড়া অন্যের প্রতি সীমাহীন বিদ্বেষ, নিজ ছাড়া অন্যকে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, পাপী, আবর্জনা, ক্ষতিকর ও বিষাক্ত ভাব। অন্যকে পাপী, ক্ষতিকর বিশ্বাস করে তার ওপর নির্যাতন, তাকে হত্যা করা বৈধ জ্ঞান। যে তরুণেরা এই বিষাক্ত মতাদর্শে জারিত, তাঁরা একেবারেই যন্ত্র, তাঁরা নিজেরাও জানেন না তাঁদের নিয়ন্ত্রণচাবি কার হাতে। 'আমরা যা বলব, সেটাই পরম সত্য, এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন যে তুলবে, যে বিরোধিতা করবে, সে-ই শত্রু। আমরা যা অনুমোদন করি না, তা কেউ বলতে, লিখতে, ভাবতে পারবে না। আমাদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে, কোনো সংশয় জিজ্ঞাসা ভিন্নমত চলবে না। এর সবই হয়রানিযোগ্য, নির্যাতনযোগ্য, নিধনযোগ্য অপরাধ।' এটাই জঙ্গিবাদী মতাদর্শের সারকথা। কিন্তু উল্টো অবস্থান বলা হলেও সরকার, তার দল, বিভিন্ন বাহিনী যেভাবে পরিচালিত হয়, তা এর থেকে কতটা ভিন্ন?

জঙ্গিবাদী মতাদর্শ দিয়ে জঙ্গিবাদ দমন করা যায় না। জঙ্গিবাদের সমাধান আসবে মানুষের মুক্ত স্বরের পরিসর কমিয়ে নয়, তা বাড়ানো: মধ্যে, সমাজে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণি, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে; ঐক্য, সমতা ও সংহতির চেতনার মধ্যে। এর ওপর দাঁড়িয়ে জনগণে সক্রিয়তার মধ্যেই এর বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধ তৈরি হতে পারে। এ শক্তি আসতে পারে প্রশ্রয় করার ক্ষমতা থেকে, সমষ্টির স্বার্থের চিন্তা; তৎপরতা থেকে। এই সময়ে সাম্প্রদায়িক হামলা ও জাতিগত ধর্মী বৈষম্য নিপীড়নবিরোধী সংহতি, সুন্দরবনসহ সর্বজনের সম্পদ ও অধিক রক্ষায় সক্রিয়তা, কৃষক-শ্রমিকের অধিকারের আন্দোলন, দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, দখলদারি, রাষ্ট্রীয় খুন-গুম নিয়ে প্রশ্র, নারীর প্রবল ও নিরা অস্তিত্বের লড়াই, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবিরোধী সজাগ অবস্থান সৃজনশীল তৎপরতার বিস্তারই দিতে পারে তরুণদের সামনে নতুন দি এসবের চিন্তা ও সক্রিয়তার গুরুত্ব তাই এখন আগের চেয়ে অনেক বে

সমাজে প্রশ্রহীন আনুগত্য, অন্ধবিশ্বাস, ক্ষমতার নৃশংসতা, ি বিশ্লেষণহীন রোবট সংস্কৃতির চাপ বন্ধ হলে জঙ্গিবাদ তো বটেই, বৈধ ধরনের সন্ত্রাস আর আধিপত্যেরই জায়গা হবে না। চারদিকের শ্রম আর চাপ থেকে তরুণেরা মুক্ত না হলে এই মুক্তির পথ তৈরি হবে এই কাজেও উদ্যোগী হতে হবে প্রধানত তরুণদেরই।

● আনু মুহাম্মদ: অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয়।

anu@juniv.edu/anujuniv@gmail.com